ভারতের কৃষক আন্দোলন: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সুনন্দিত চৌধুরী

প্রাক কথন

অরণ্যচারী মানুষ যখন "গৃহবাসী" মানে গুহাবাসী হল তখনই তার তিনটি প্রাথমিক মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের চিন্তামুক্তি ঘটল। জীবনধারণের প্রথম শর্ত অন্নসংস্থান শুরু থেকেই ছিল প্রতিযোগিতামূলক। পারস্পরিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে ফল ও শস্যের পুনরুৎপাদনের চিন্তাভাবনা, যা ক্রমশ কৃষিজ ফলন হিসাবে দূর করেছিল মানুষের অন্নভাবনা। প্রগতির সাথে সাথে কৃষি হয়ে উঠল বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখার অনন্যতম রসদ। ধরিত্রী ক্রমশঃ হয়ে উঠলো শস্যশ্যামলা।

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে নব্য প্রস্তরযুগ বা নিওলিথিক যুগের পাথরের মসৃণতা আসে ঘর্ষণের মাধ্যমে। তাই এটা অনুমান করা হয় যে প্রস্তরখণ্ডগুলি মসৃণতা লাভ করেছিল শস্য ভাঙ্গা বা কর্ষণের জন্য, যা কৃষির বিকাশের সাথে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। বন্য তৃণ, উদ্ভিদের বীজ ও অন্যান্য ভোজ্য বন্য শস্য ও ঘাস মানুষের খাদ্যের বৃহত্তম উৎস হয়ে ওঠে। চাষের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের জন্য সিন্ধু-গাঙ্গেয় অববাহিকা ও অন্যান্য উৎসের আশেপাশে গড়ে ওঠে ছোট-বড়-মাঝারি জনগোষ্ঠী, যা সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে প্রমাণিত।

Society Language and Culture

যাই হোক, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কৃষিকাজ যখন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেল ততদিনে গড়ে উঠেছে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। গড়ে উঠছে বসতি, গ্রাম, নগর, বন্দর। মানুষ নানাবিধ কৃষিজ ও সামগ্রীর আদান-প্রদানে হয়ে উঠছে অভ্যস্ত। বাণিজ্য হয়ে উঠছে এক শ্রেণির মানুষের অন্যতম অর্থ উপার্জনের পথ।

পটভূমি

ভারত বরাবরই ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। সেই সময় অবিভক্ত ভারতের কৃষিজ উৎপাদন অন্যান্য অনেক দেশের নজর কেড়েছিল। ভারতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর হাত ধরে শুরু হয় কৃষি বিপ্লব। কৃষি ছিল অর্থ উপার্জনের মূল উপায়। পরবর্তীকালে মৌর্য, গুপ্ত ও ইসলামিক যুগেও আয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রতিটি যুগের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল কারণ কৃষির প্রতি নজরদারি না রাখা এবং কৃষিজাত পণ্যের সুষম বন্টনের অভাব। সমস্যা সমাধানের জন্য সবকটি ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রথম অভিঘাত হেনেছিল কৃষকরাই।

কৃষির পাশাপাশি ভারত ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল বাণিজ্যে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষির অনুষঙ্গ হিসেবে উৎপাদিত হচ্ছিল কার্পাস। বন্দরনগরীগুলোর আশেপাশে উপকূল বরাবর গড়ে ওঠে একের পর এক বস্ত্রশিল্প। তাঁতবস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায় বিদেশে। আমদানি হতে থাকে বিদেশি মুদ্রা। চাঙ্গা হয়ে ওঠে ভারতীয় অর্থনীতি। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"। ভারতীয় বাণিজ্যে লক্ষ্মী বসেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে ভারতে বাণিজ্যবৃত্তির হাত ধরেই ঔপনিবেশিক শাসন জাঁকিয়ে বসেছিল, একথা সকলেরই জানা।

প্রেক্ষিত

১৮৩০ সাল। ভারতে তখনও সাম্প্রদায়িকতার তেমন কোনো ছাপ পড়েনি। সুদূর আরব দেশের ওয়াহাবি আন্দোলনের একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল ভারতে। আসলে ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল ইসলামিক আত্মশুদ্ধিকরনের আন্দোলন, আত্মজাগরণের অঙ্গীকার। এহেন একটি ভিন্নধর্মী আন্দোলন জড়িয়ে গেল ভারতের অন্যতম কৃষি আন্দোলনের সাথে। খাদ্যশস্য, যা ছিল ভারতীয়দের মূল কৃষিজ উৎপাদন তা বন্ধ করে জোর করে নীল চাষ করাতে বাধ্য করত ইংরেজ শাসকেরা। তবে যতদূর জানা যায়, ভারতে নীলচাষের আগমন ঘটে ১৭৭৭ সালে লুইস বোনার্ড নামে এক ফরাসি কৃষিবিদের হাত ধরে। ভারতের আবহাওয়া নীলচাষের সহযোগী হওয়ায় এবং নীলচাষে লাভের কথা মাথায় রেখে বিদেশি বণিকেরা খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় বন্ধ করে সেই জমিতে নীলচাষের আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু চাষীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক নীলকর আদায় করার জন্য দমন-উৎপীড়ন চলতে থাকে। যে মাটি মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য শস্য উৎপাদন করত সেই মাটিতে জোর করে নীলচাষ করতে বাধ্য করা হত এবং পরিণামে জুটত বঞ্চনা, অবহেলা, অত্যাচার।

১৮৩২ সালে তিতুমীরের অনুগামীরা বারাসতে নীলকর সাহেবদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। প্রায় একই সময়ে দুধু মিয়ার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় ফরাজি আন্দোলনকারীরাও তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছিল নীলকর সাহেবদের। ১৮৫৭ সালে এই আক্রমণের ধার ও ভার দুই-ই প্রবল হয়।

১৮৫৯-৬০ সালে শুরু হল আন্দোলন - নীল বিদ্রোহ। সম্ভবত সারা বিশ্বে প্রথম সংগঠিত কৃষি আন্দোলন হল এই নীল বিদ্রোহ। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৬০ সালে তৈরি হল নীল কমিশন।

Society Language and Culture

১৮৫৭ সালের পর থেকেই ভারতে দমন-পীড়নমূলক ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায়। যার স্ফুলিঙ্গ পড়েছিল নীল বিদ্রোহে। একদিকে কৃষকদের মতাদর্শ ও অন্যদিকে তাদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ কৃষক আন্দোলনকে অনেক বেশি সংগঠিত করেছিল সন্দেহ নেই। উপজাতীয় ও অনুপজাতীয় উভয় শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যেই ঔপনিবেশিক শাসন প্রণালী, আইনকানুন ও নীতি এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক বেশি বোধ জন্মেছিল। আবার দুর্দশাক্লিষ্ট কৃষক সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অংশগ্রহণ কৃষক আন্দোলনকে অন্য মাত্রা প্রদান করেছিল। একদিকে ভারতীয় ঢঙে অর্জিত অভিভাবকতা এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য চরিত্রের আরোপিত মানসিকতায় পুষ্ট তৎকালীন মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী মধ্যস্থতা স্থাপনেই বেশি তৎপর হয়ে উঠেছিল। ফলে কৃষক আন্দোলন যে দ্বিমুখী ধারায় বইতে লাগল, তা বলাই বাহুল্য।

অনুভব

দীর্ঘদিনের অত্যাচারিত নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষোভ এতটাই উদগারিত হয়েছিল যে তার প্রভাব পড়েছিল সাহিত্য সংস্কৃতিতেও। নীল বিদ্রোহের আগুনের ছোঁয়ায় জ্বলে উঠেছিল দীনবন্ধু মিত্রের লেখনী। সৃষ্টি হল নাটক "নীল দর্পন"। ইংরেজি অনুবাদ করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মিশনারি সোসাইটির রেভারেন্ড জেমস লং ওই অনুবাদের প্রকাশনার অভিযোগে এক হাজার টাকা জরিমানা-সহ একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গর্জে ওঠে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। বিশেষ করে হিন্দু পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ নীলচাষীদের পক্ষে কলম ধরে। মজার ব্যাপার হল, কলকাতায় যখন দেশীয় জমিদারদের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয় তখন এই একই হিন্দু পেট্রিয়ট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা জমিদারদের পক্ষ নিয়ে লিখতে শুরু করে। দীর্ঘমেয়াদী এই বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু বাংলা থেকে

সরে যায়। ১৮৭৪ সালের দ্বারভাঙ্গা আন্দোলন ও তার অনেক পরে ১৯০৭ সালের চম্পারন আন্দোলনেও নীলচাষীদের প্রতিরোধ কর্মসূচি দেখা যায়। তবে নীলকর সাহেবদের পেশীশক্তির কাছে এবং সরকারি হস্তক্ষেপে এই আন্দোলন তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। চম্পারনে নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে ১৯১৭ সালে গান্ধীজিকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

ভারতে যে কৃষি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল নীল বিদ্রোহের মাধ্যমে, পরবর্তীকালে একাধিক আন্দোলন ভারতীয় কৃষক সমাজকে সংগঠিত করে তুলেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে গোটা ভারতবর্ষে মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধের ঘটনা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। ব্রিটিশরাজ আরোপিত ভূমি ব্যবস্থা, সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিবিধ আইন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত হত একাধিক আন্দোলন।

বিস্তার

এই সময়ে ভারতের বাইরেও শুরু হয়েছিল গণ-অভ্যুত্থান। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সূচনা হলো ভ্লাদিমির লেনিনের হাত ধরে। রাশিয়া পরিণত হল সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকে। ভারতীয় রাজ্য রাজনীতিতেও এল এর আঁচ। তৈরি হল বামপন্থী কৃষক সংগঠন। সাম্যবাদী মনোভাব কৃষক সংগঠনগুলোকে করে তুলল আরও শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী।

প্রকৃতপক্ষে অনেক কৃষি আন্দোলনই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের অবসান দাবি করেছিল। ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনও কৃষকদের ফসলের অধিকারের দাবিতে জমিদারদের বিরুদ্ধে এক গণ-আন্দোলন। শুধু তাই নয়, কোল, ভিল, মুন্ডা, রাজবংশী ইত্যাদি বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলো নিজেদের সুবিধার্থে তৈরি করেছিল নিজস্ব কৃষক সংগঠন।

Society Language and Culture

স্বাধীনতা ও স্বপ্ন

১৯৪৭ সালের পটভূমি তৈরি হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী জাতীয়তাবাদ আন্দোলন নিশ্চিত করল ভারতের স্বাধীনতা। পরাধীনতার বন্ধনমুক্ত গণপ্রজাতন্ত্রী ভারত স্বপ্ন দেখল এক নতুন ভোরের। কিন্তু ...

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ” - সত্যিই দুর্ভাগ্য আমাদের যে স্বাধীনতার পরেও আমাদের কৃষক বন্ধুদের দুর্দশা দূর হল না। কারণ, আমাদের স্বাধীনতা এসেছিল চুক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীনতা নিয়ে। আপোষহীন নেতৃত্বের অভাবে একাধিক চুক্তিকে মেনে নিয়ে ভারত পেল কাঙ্খিত “স্বাধীনতা”।

১৯৬৭ সালের ২৫ মে। আবার কৃষকদের অধিকারের দাবিতে গর্জে উঠল ছোট্ট একটি জনপদ – নকশালবাড়ি। স্বাধীন ভারতের পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাল আটজন কৃষক পরিবারের গৃহবধূ, একজন কৃষক ও দুই শিশু। আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে এবং ক্রমে বিশ্বব্যাপী। আন্দোলনের রেশ কেবলমাত্র কৃষক পরিবারে আবদ্ধ থাকল না, ছড়িয়ে পড়ল সেই সময়ের তরুণ-যুবা, বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে। বামপন্থী ভাবধারায় আশ্রিত এই আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে সায় দিয়েছিলেন চীনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাও জে দং। চারু মজুমদার, কানু সান্যালের নেতৃত্বে এই আন্দোলন স্থান পায় ইতিহাসে।

পরিশেষ

ভাবতে লজ্জা লাগে, যে দেশ মহাকাশে নিজস্ব প্রযুক্তিতে উপগ্রহ পাঠাতে সক্ষম, যে দেশ কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বের অনেক দেশকে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যে দেশ চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্বাবলম্বী, সেই ভারতবর্ষের কয়েক হাজার কৃষকবন্ধু ও তাদের পরিবারকে স্বাধীন দেশের সরকারের বিরুদ্ধে আজও পথে নামতে হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অন্ধকারে রেখে আরোপিত কৃষি আইনের প্রতিবাদে পথে নামা কৃষকদের উপর স্বাধীন সরকারের নির্দেশে দাগা হয় জলকামান। অর্ধাহারে-অনাহারে, প্রচণ্ড ঠান্ডায় নিজেদের অধিকার কেড়ে নিতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হয় একাধিক কৃষককে। এ কোন স্বাধীনতা! এই স্বাধীনতাই কি আমরা চেয়েছিলাম?

প্রশ্নটা তো সহজ। উত্তর? .... অজানা।

১) বিপান চন্দ্র ... পৃষ্ঠা ৪৭২-৫১৭ আনন্দ পাবলিশার্স

২) রণবীর চক্রবর্তী , পৃষ্ঠা ১০৬-১৭৬, সুবর্ণরেখা

৩) গৌতম ভদ্র, পৃষ্ঠা ১১৯-১৫৩, আনন্দ পাবলিশার্স

৪) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৮২-৯৫, Orient Longman

Society Language and Culture

(Shri Sunandit Choudhury is an Author, Department of Journalism and Mass Communication, Vijaygarh Jyotish Roy College, Kolkata, West Bengal)